যুদ্ধের যিশু

দিলরুবা শাহানা

আমার কাজের সূত্রে মাঝে মাঝে মেডিকেল পেশায় জড়িত লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাত হয়। তেমনি একজন হচ্ছেন স্পেসালিষ্ট ডঃ জেইন। একদিন জেইনকে যখন তার রুগী নীনার কথা গুলো ইংরেজীতে বলছি তখন ঘটলো ঐ ঘটনা। কেউ চেম্বারে ঢুকে ফাইলিং কেবিনেট থেকে জরুরী কিছু নিতে এসেছিল। চলে যেতে যেতে কথা শুনে ফিরে তাকালো, ততক্ষণে জেইনের কথা নীনাকে তার ভাষায় ব্যাখ্যা করছি দুই পা এগিয়ে এসে ছেলেটি দাড়ালো। কথা শেষ হতেই জেইনের দিকে তাকিয়ে 'এক্সিউজ মি' বলে আমাকে প্রশ্ন করলো আবার নিজে নিজেই উত্তরও বের করে ফেললো

-ইজ ইট ইওর মাদারটাং? ইট ইজেন্ট, রাইট?

আমার চামড়ার রংয়ের সাথে মুখের ভাষার মিল নেই এটা বুঝে গেছে। আমি মাথা দোলালাম। ডঃ জেইন সময় বাঁচানোর জন্য বলে উঠলেন

-আমাদের কাজটা শেষ করতে দাও, এরপরে তুমি ওর সাথে কথা বলতে পার।

আমার দিকে তাকিয়ে জেইন বলেন- আমিই সিবাষ্টিয়ানকে তোমার কথা বলেছিলাম; ওর সঙ্গে কথা বলে তুমি ওর রহস্য নিয়ে গবেষণা করে কিছু বের করতে পার কিনা দেখ।

আমার যেমন মুখের ভাষাটা চামড়ার রংয়ের সাথে মিলেনি বলে ও বিস্মিত, আমারও খটকা লাগলো ওর চামড়ার রংয়ের সাথে চুল আর চোখের রংয়ের অমিল দেখে।

একটু পরেই যখন রুম থেকে বাইরে পা রাখলাম দেখি করিডরের আরেক মাথা থেকে সিবাষ্টিয়ান নামের ছেলেটি আসছে। আমাকে দেখে দ্রুত পা চালালো। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো

-আমি সিবাষ্টিয়ান গ্রান্ট আর জেইন বলেছে তুমি মাল্টিলিংগুয়াল।

-দুটো ভাষা জানলে যদি কাউকে মাল্টি লিংগুয়াল বলা যায় তবে ধরে নাও তাই

-দুটো ভাষা যে বলতে পার নিজেই দেখলাম, মায়ের ভাষা যে এ দুটোর একটাও নয়, তাও আন্দাজ করছি; মাতৃভাষাটা জানতো? কি সেটা?

কথাটা শুনে কেমন একটা ঝাঝ চলে এল বললাম

-কেন জানবোনা? বাংলা, তবে ইংরেজীর মতো সহজ নয়, কঠিন তবু সুন্দরভাষা।

-তাইতো জেইন বলেছে ঠিক কথা। মাল্টি লিংগুয়াল, শুধু বিলিংগুয়াল না। কিছু মনে করনা তোমাদের মত অনেকে ইংরেজীটা জানলে নিজের ভাষাটা বলেই না বা শিখেই না কি জানি পাছে উচ্চারণ নষ্ট হয়ে যায় তাতে।

-চামড়া তোমার সাদা হলেও তোমারও কোথায় যেন আলাদা কিছু আছে।

-এই আলাদা কিছুর গল্প হবে। জেইন বলেছে তুমি কিসব নিয়ে যেন গবেষণা কর।

আমি ভাবছিলাম জেইন কেন বলেছে আমার কথা। জেইন বিশ বছর ধরে মেডিকেল স্পেসালিষ্ট হিসাবে কাজ করছে। তার আগে তাকে গাদা গাদা পড়াশুনা করতে হয়েছে স্পেসালিষ্ট হওয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত প্রফেসনে আপ টুডেট থাকার জন্য পড়েই যাচ্ছে। ওকে একদিন বলেছিলাম

-তোমার ধৈর্য অনেক! এতো পড়াশুনা কর কি করে?

-তোমারও ধৈয আছে নাহলে এতগুলো ভাষা শিখতে পারতেনা। আমি জানি একটা মাত্র ভাষা ইংরেজী, তাও ততো ভালনা।

জেইনকে বলিনি যে ফ্রেন্চ শিখতে গিয়েছিলাম। ঐ ভাষার 'র' উচ্চারণ করতে গিয়ে যখন জিব, আলজিব দুটোই ব্যথা হল তখন সে আশা বাদ। স্প্যানিশভাষাতে চৌদ্দটা টেন্স না থাকলে উচ্চারণে আটকাতে পারতোনা, তবে ঐ টেন্সের যন্ত্রনা থেকে যতদূরে থাকা যায় ততোই ভাল।

সিবাষ্টিয়ানকে ওর নাম শুনে মনে হল জার্মান। জিজ্ঞেস করতে বললো

-আমার মা অষ্ট্রিয়ান, বাবা ইংরেজ আর আমি? বলবো না, দেখি তুমি আন্দাজ করতে পার কি না।

আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম। ছেলেটি তখন বললো

-সময় থাকলে চল ঐখানে বসে কফি খাওয়া যাক

কোনায় একটি কফিশপ আমরা এগিয়ে গিয়ে বসলাম। বেশ কিছু সময় কথাবার্তা হল। আমার অনুসন্ধিৎষু মন ওর রহস্য জানতে অস্থির হলেও বাইরে এক নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে রাখলাম।

সিবাষ্টিয়ানের ছোটবেলা কেটেছে ইংল্যান্ডে। মা নার্স আর বাবা ছিলেন স্কুলের আর্টটীচার। ওর যখন বছর বারো বয়স বাবা এক সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান। তার বছর দেড়েক পর ওর মা চাকরী নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে চলে আসে। সেই থেকে ওরা এখানেই আছে। নার্স হিসাবে জেইনের সঙ্গে কাজ করেছে, জেইনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। সিবাষ্টিয়ানকে খুব যত্ন আর আদরে মানুষ করেছে মা। নাইটক্লাব বা ড্যান্স পার্টি ইত্যাদিতে আগ্রহ ছিলনা ওর মায়ের। সখ ছিল সিনেমা, থিয়েটার দেখা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভান্ডার খুঁজে বেড়ানো। একবার এক পাহাড়ী নদীর কাছে গিয়ে সুন্দর এক পাথরের উপর বসতে বসতে বলেছিল

-ইশ্ তোর বাবা এইখানে আসতে পারলে খুব খুশী হত।

তখন সিবাষ্টিয়ানের ষোলবছর হয়ে গেছে। কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছে। তখনই সে বুঝলো বাবার জন্য মায়ের হাহাকার স্থায়ী হয়ে গেছে। ছোটবেলা ছুটিরদিনে নদী আর সমুদ্রের কাছে কত বেড়াতে যেত। বাবা ছবি আঁকতো, মা আর সে কখনো সাতার কাটতো, বল ছুড়াছুড়ি করে খেলতো কখনো। খাবারের আয়োজনে লাগলে বাবা এসে হাত লাগাতো। সালাড কাটতো বাবা। সবসময় টমেটো, গাজর দিয়ে ফুল কেটে রাখতো মায়ের প্লেটে আর শশা, গাজর আর দিয়ে মাছ বানিয়ে রাখতো সিবাষ্টিয়ানের প্লেটে।

স্কুলের দিন শেষ হয়ে এল। ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের ডিনারে মা আসলো। তখন একটা বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করলো বেশ কৌতূহল নিয়ে। যাতে ওর মনেও খট্‌কাটা লাগলো তখনি। এ্যালবামে বাবামায়ের সাথে ছবিগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল 'আশ্চর্যতো! আমি কোথা থেকে এলাম এদের কাছে?'

-কি ছবি দেখছিস অতো মন দিয়ে?

-জান মা, স্কুলে সবাই বলছিলো তোমার সাথে আমার কোনই মিল নেই আর এখন দেখতে পাচ্ছি বাবার কোনকিছুও আমি পাইনি; আমি তাহলে কার মতো দেখতে মা?

মা ব্যাপারটাকে এড়ানোর জন্য পাত্তাই দিলনা। হেসে বললো

-কার মতো আবার? আমার মতো। আমার মতো ফর্সা, আমার মতো চিকন লম্বা।

আমিও পড়া শেষ করলাম মাও অসুস্থ হতে শুরু করলো। প্রচুর রক্তের দরকার হল। রক্ত দিতে গিয়ে দেখলাম গ্রুপ মিললোনা, শুধু রক্ত নয় আরও অনেক কিছুই মিলেনি। মায়ের দিন ফুরিয়ে আসছিল। একদিন তার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম

-তোমার কিছুই আমার মাঝে নাই, না তোমার চুল, না তোমার নাকচোখ, এমনকি রক্তের গ্রুপও নয়

তার ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখে উজ্জল চোখ ঠিকরে মায়াময় এক আলো ছড়ালো

-আমার ভালবাসা তোর মাঝে রইলো যা তুই আমারই মতো বিলিয়ে দিবি তাদেরকে যাদের দরকার; তবে তোকে আমার কিছু বলার আছে।

ঐদিনের মতো কথা শেষ হল। সিবাষ্টিয়ান মেডিকেল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টের উপর পিএইচডি করছে। কার সাথে ওকে এব্যাপারে তথ্য জোগারে যেতে হবে। আরেকবার দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করে উঠলাম।

আমার শুধু একটাই ভাবনা ঘুরে মাথায়। আমাকে কেন সে এতো কথা শুনাচ্ছে? চারসপ্তাহ সময় কবে শেষ হবে যখন ভাবছি তখন একটা ফোন এলো।

-হ্যালো

-আমি সিবাষ্টিয়ান, সিবাষ্টিয়ান গ্রান্ট

-বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে সিবাষ্টিয়ান নামে একজনকেই আমি চিনি যে হল তুমি; কি ব্যাপার?

-তুমি কি আজ বিকেলে চারটার দিকে ঐ কফিশপে একবার আসতে পারবে?

আমি ঘটনার শেষ জানতে খুব আগ্রহী আবার এদিকে নিজের বাচ্চাটাকেও স্কুল থেকে আনতে হবে। দোটানায় পড়ে গেলাম।

-আচ্ছা সময়টা সাড়ে চারটা হলে কেমন হয়?

-ঠিক আছে; টেলিফোনেও কথা বলা যাবে তবে আমি তোমাকে কিছু দেখাবো বলে এনেছি। অবশ্যই আসবে।

আমি ওকে বাসায় আসতে বললে সে হয়তো আসতো। তবে আমি চাইনা স্বল্প জানা একজনকে খালি বাড়ীতে ডেকে আনতে। ভাবছিলাম কি সে আমাকে দেখাতে চায়। মোটামুটি সব কাজ গুছিয়ে সাড়ে চারটায় কফিশপে পৌছে দেখি ও অপেক্ষা করছে। আমরা একপাশে টেবিল নিয়ে বসলাম। সিবাষ্টিয়ান একটি প্যাকেট টেবিলে রেখে কাউন্টার থেকে কফি আনতে গেল। আমি ওকে দেখছিলাম। ফ্যাকাসে ফর্সা সে নয়, মাখনের মতো মসৃন ফর্সা। চুলের রং ঘোর কালো, তবে চোখ গুলো খয়েরী মতো। লম্বা একহারা গড়ন। আজকে ওকে সুখী মনে হচ্ছে খুব। টেবিলে কফি রাখতে রাখতে বললো

-আজকে আমাকে কনগ্রাচুলেট করতে পার

-কি ব্যাপার?

-পড়শু আমি ইংল্যান্ড যাচ্ছি। স্কলারশিপ নিয়ে। কৃতিত্ব জেইনের ও আমার স্কলারশিপ জোগারে সাহায্য করেছে।

-অভিনন্দন জানাই। তাইতো বলি হঠাৎ করে তুমি আজ কেন ডেকেছ

কফির সাথে শুরু হল গল্প। এই গল্পের আসরে একাই আমি শ্রোতা। আমাকে চমকে দিয়ে এবার ও বললো

-জান আমি কিন্তু বাংলাদেশী

-মানে তোমার জন্ম বাংলাদেশে, তাহলেও জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাংলাদেশ দেয়না এই আইন আমি ভাল জানি।

-আসলে আমাকে বাংলাদেশ থেকে এডাপ্ট করে এনেছিল আমার মা।

-ওহ.....বুঝেছি।

আমি ঠোঁটের কাছ থেকে কথা গুলোকে মুখের ভিতরে নিয়ে গিলে ফেললাম। আমি বাংলাদেশে যে সর্বসাধারনের জন্য দত্তক নেওয়ার আইন নাই তা ভালভাবে জানি। এও জানি মুক্তিযুদ্ধের পর সরকার Abandoned Childrens Act(পরিত্যক্ত শিশু আইন) জারী করেছিলেন। এর আওতায় বিদেশীরা অনেক পরিত্যক্ত বাচ্চাকে লালন পালনের জন্য বিদেশে নিয়ে যায়। মনে মনে ভাবলাম এই ছেলেটি তাদের কেউ একজন হয়তো। হতে পারে নাও হতে পারে। ও ফর্সা তবে সাদাদের মত লাবন্যহীন ফর্সা নয়। চুল আর চোখ ওর শ্বেতাঙ্গদের মতই নয়] গল্প চলে

‘অষ্ট্রিয়ান নার্স হেলেন বালার্ড রেডক্রসের সঙ্গে বাংলাদেশে কাজ করতে যায়। ওখানে মিশনারীদের এক হাসপাতালে অসুস্থ, স্মৃতিভ্রষ্ট তারউপর গর্ভবতী এক নারীকে সে দেখে। কোথা থেকে সে এসেছে, কার সে কন্যা, কার সে স্ত্রী কেউই জানেনা। হালকা পাতলা ফর্সা লম্বা সে হতভাগিনী পিঠে দীর্ঘ কালো চুল ছড়িয়ে হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে থাকতো শূন্য দৃষ্টিতে। কোন প্রত্যাশা ছিলনা, বোধহয় কোন যন্ত্রনাও ছিলনা ওই চাউনিতে শুধু ছিল শূন্যতা, অপার শূন্যতা। বোধহয় যুদ্ধ ওর সব কেড়ে নিয়েছিল, কেড়ে নিয়েছিল ওর স্বজন, ওর নিরাপত্তা, ওর স্মৃতি, নাকি আরও কিছু?

তবে এই ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত ছিলনা। হেলেনের খুব মায়া পড়ে গেল মেয়েটির জন্য। তবে বেশীদিন ঐ স্নেহ ভোগের জন্য রইলোনা সে। সন্তান জন্মানোর পরপরই সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ওর বেঁচে থাকার অপেক্ষায় কেউ ছিলনা। তাই মৃত্যুই পরম মমতায় সব কষ্ট থেকে ওকে মুক্তি দিল। হেলেন এসে দেখলো মেয়েটি সন্তানকে রেখে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। হেলেনের মনে পড়লো ও এসে যখন একটি হাত মেয়েটির চুলে রাখতো তখন মেয়েটি দুইহাতে হেলেনের অন্য হাতটি আকড়ে ধরে অসহায় চোখে দেখতো। সহজে হাতটা ছাড়তে চাইতো না। ঐ চোখে কোন আকুতি ছিল হেলেন বুঝেনি। তবে বাচ্চাটাকে দেখার পর মনে হল ঐ বাচ্চাকে তারই দেখতে হবে। সে চেষ্টা করেছিল খোঁজখবর বের করতে। নানা জনের কাছ থেকে টুকরো খবর পায়। মেয়েটি সম্ভ্রান্ত বাড়ীর বউ। বাপের বাড়ী এসেছিল গর্ভবতী অবস্থায় যত্ন ও আদরে থাকবে বলে। পাকসেনা মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে এলাকায় অত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। ঝড় থামলে অনেকের সাথে মেয়েটিকেও আধমরা অবস্থায় এলাকার স্কুল ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। মেয়েটির বেঁচে যাওয়া আত্মীয়রা ভারতে পাড়ি জমায়। তাদের সংস্কার তাদের মানবিক মমতা ও ভালবাসাকে হত্যা করেছিল। তাই ঐ হতভাগীর আশ্রয় জোটে মিশনারীদের হাসপাতালে। হেলেন অনেক ঝামেলা করে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে পারে। তবে স্মৃতি হিসাবে কিছুই জোগার করে আনতে পারেনি। শুধু আমার মায়ের হাতের এদুটো চুড়ি ছাড়া।'

কথা শেষ করে সিবাষ্টিয়ান টেবিলে রাখা প্যাকেট থেকে গোল শান্তিনিকেতনী চামড়ার কৌটাটি বের করলো। ডাকনা খুলে কৌটাটি আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি হাতে নিয়ে দেখি দুটি শাঁখা রয়েছে তাতে। বিবাহিতা বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ের অনেক যত্নের ধন শাঁখাসিঁদুর। সিবাষ্টিয়ান গভীর মমতায় শাঁখা গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো

-আমার গর্ভধারিনী বোধহয় আমাকে এক নজর দেখার জন্যই লাঞ্ছনা কষ্ট সহ্য করে আমার জন্ম পর্যন্ত বেঁচেছিল।

এবার আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম

-আচ্ছা, তোমার কি কখনো বাবার কথা জানতে ইচ্ছে করেনা?

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ও তর্জনি তুলে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললো

-শ্...শ্

তারপর বললো

-মা (হেলেন) যখন অসুস্থ একই কথা আমিও মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। মা তখন পৃথিবীর সেরা সুন্দর কথা বলেছিল 'শ্ শ্ যিশুর বাবা ছিলনা, যুদ্ধের সন্তানেরাও যিশুর মত। তুমিও আমার যুদ্ধের যিশু'।